Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 38–45
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

বিশ্বযুদ্ধ আবেগ ও বাস্তবতার দ্বন্দ্ব : প্রসঙ্গ মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের 'কল্যাণ-প্রদীপ'

তীর্থঙ্কর মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: tirthankar.raju@gmail.com

Keyword
কল্যাণ-প্রদীপ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ইংল্যান্ড-তুরস্ক যুদ্ধ, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর চিঠি, যুদ্ধবিরোধী মানবিক বয়ান

Abstract
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত সাহিত্য এবং আলোচনার সংখ্যা খুবই কম। মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের 'কল্যাণ-প্রদীপ' প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকে অবলম্বন করে রচিত জীবনী গ্রন্থ। আশি বছর বয়সী বৃদ্ধা দিদিমা তাঁর নাতি কল্যাণকুমার মুখার্জির জীবনকাহিনিকে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। কল্যাণকুমার বিলেত থেকে ডাক্তারি পাশ করে দেশে ফিরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় শাসক ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধকালীন ডাক্তার হিসাবে ইংল্যান্ড-তুরস্ক যুদ্ধে যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবন্দী অবস্থায় রোগীর সেবা করতে করতেই টাইফয়েড রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তার।

মোক্ষদায়িনী তাঁর এই নাতির জীবনকাহিনীকে শুধুমাত্র জীবনীর গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ রাখেননি। জীবনের ঘটনাপঞ্জি বর্ণনাকে অতিক্রম করে প্রথমে বাংলার অতীত-বর্তমান ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন ও সেইসঙ্গে পারিবারিক ইতিহাস ও জীবনবৃত্তান্তকে জুড়ে ব্যাখ্যা করেছেন। সবশেষে কল্যাণের যুদ্ধযাত্রা অনুসরণ করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইংল্যান্ড-তরস্ক যুদ্ধের বর্ণনা করেছেন তিনি। বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের মূল আলোচনা এই যুদ্ধবর্ণনা, তার পরিকল্পনা এবং গ্রন্থমধ্যে প্রকাশিত যুদ্ধসংক্রান্ত বাস্তবতার স্বরূপ নিয়ে।

ইতিহাস-সচেতন মোক্ষদায়িনী দেশের যুবসমাজকেও ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ বাস্তবতার বিষয়ে সচেতন করতে চেয়েছেন। দীর্ঘ অধ্যাবসায়ে নানান সূত্র থেকে তথ্যসংগ্রহ করে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেগুলিকে যুদ্ধবর্ণনার ক্ষেত্রে যুক্তিগ্রাহ্য ও বাস্তবসম্মতভাবে সজ্জিত, গ্রথিত করেছেন মোক্ষদায়িনী। যুদ্ধবর্ণনার সময় ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পটভূমি যেমন বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনই ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক বিষয়ের বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনাও *কল্যাণ-প্রদীপ* গ্রন্থটিকে সারবান করে তুলেছে।

তবে যে বিষয়টি এই গ্রন্থের যুদ্ধবর্ণনাকে অনন্যতা এনে দিয়েছে তা হল চিঠির ব্যবহার। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কল্যাণকুমারের পাঠানো অনেকগুলি চিঠি পাঠানোর তারিখ এবং স্থান সহ সরাসরি উদ্ধৃত করেছেন মোক্ষদায়িনী। আর সেই চিঠিগুলি থেকে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির পাশাপাশি যুদ্ধক্ষেত্রে সরাসরি অংশগ্রহণকারীর মানবিক বয়ান তুলে ধরেছে

আমাদের সামনে। যুদ্ধক্ষেত্রের আভ্যন্তরীণ ভয়াবহতা, মৃত্যুস্রোত, কাতরোক্তি ইত্যাদি স্পষ্টভাবে সামনে এসে পড়েছে এই চিঠিগুলির মাধ্যমে। বাইরে থেকে নির্মিত যুদ্ধবিষয়ক আবেগ, রোমান্টিকতার বিপরীতে শান্তিকামী, যুদ্ধবিরোধী মানবিক বয়ান *কল্যাণ-প্রদীপ* গ্রন্থের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে।

মোক্ষদায়িনীর গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ছিল দেশের ভগ্নোদ্যম যুবকশ্রেণিকে উৎসাহিত করা। চিঠির মাধ্যমে প্রকাশিত যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর মানবিক বিবরণ গ্রন্থরচনার সেই উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করেছে। আর এই আপাত ব্যর্থতাই বিশ্বযুদ্ধের বাস্তবিক বয়ান হিসাবে গ্রন্থটিকে সার্থক করে তুলেছে।

Discussion

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতি বা বিশ্বযুদ্ধকালীন সাহিত্যের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে চর্চার পরিসর অনেকখানি তৈরি হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত সাহিত্যের সম্ভার এবং আলোচনা দুই-ই অত্যন্ত কম। অথচ বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক জুড়ে বাঙালি জীবনে এই বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবও খুব কিছু কম ছিল না। বহু বাঙালি এই বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নানা বিভাগে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৮-১৯৩০) কল্যাণ-প্রদীপ এমনই একটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বাঙালির অংশগ্রহণের কাহিনিকে আশ্রয় করে রচিত জীবনী গ্রন্থ। আশি বছর বয়সী বাঙালি গৃহবধু মোক্ষদায়িনী তাঁর আদরের নাতি কল্যাণকুমার মুখার্জির (১৮৮২-১৯১৭) জীবনকাহিনিকে আশ্রয় করে লিখেছেন কল্যাণ-প্রদীপ। এই কল্যাণকুমার মুখার্জি বিলেতে গিয়ে আই.এম.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তারপর দেশে ফিরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবহে ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধকালীন বাঙালি ডাক্তার হিসাবে ইংল্যান্ড-তুরস্ক যুদ্ধে যোগদান করেছে এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবন্দী অবস্থায় শিবিরে থাকাকালীন টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। সেই জীবনকাহিনিকে আশ্রয় করে এই রচনা হলেও গুরুত্বপূর্ণভাবে মোক্ষদায়িনী এই গ্রন্থকে শুধুমাত্র জীবনী বর্ণনায় সীমাবদ্ধ রাখেননি। জীবনীর সূত্র ধরে তিনি প্রথমে বাংলার কয়েকশ বছরের ধর্মীয়-রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক পটভূমিকে তুলে এনেছেন এবং পরে কল্যাণের যুদ্ধযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধের বিস্তারিত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাও দিয়েছেন। অতীত, বর্তমান সব ধরনের ইতিহাসের মধ্যে সাবলীলভাবে চলাচল করে, ধর্ম-রাজনীতির পাশাপাশি প্রয়োজনমতো সামাজিক-প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক সচেতনতার পরিচয় দিয়ে, আশ্চর্য, অভিনব এবং নানান দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন মোক্ষদায়িনী। গ্রন্থটি সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ থাকলেও বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সে বিষয়ে অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করে এই গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশিত বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতি এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে আবেগ ও বাস্তবতার যে পার্থক্য এখানে ধরা পড়েছে— সেই বিষয়টিই মূলত ধরার চেষ্টা করব।

যে কোনও কারণেই হোক, মোক্ষদায়িনী ও তাঁর সৃষ্টিসমূহ বর্তমানে প্রায় বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে বসেছে। বাংলা সাহিত্যের জগতে সংখ্যার বিচারে খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও উনিশ শতকীয় পটভূমিতে নারীশিক্ষা, সশক্তিকরণ ইত্যাদির ইতিহাসে মোক্ষদায়িনীর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছিল। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে প্রথম সম্ভাব্য মহিলা সম্পাদক তিনি। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *বঙ্গমহিলা* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে উল্লেখিত 'খিদিরপুর নিবাসিনী জনৈক মহিলা'-কে গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৫২) মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রথম মহিলা প্যারডিকারের সম্মানও মোক্ষদায়িনীর প্রাপ্য। সমকালীন প্রতিষ্ঠিত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৯০৩) 'বাঙ্গালীর মেয়ে' নামক নারীসমাজের প্রতি ব্যঙ্গ-আক্রমণমূলক কবিতার প্রতিবাদ হিসাবে 'বাঙালীর বাবু' নামক প্যারডি রচনা করে তিনি নানান ক্ষেত্র থেকে প্রশংসা পেয়েছিলেন। এছাড়াও নিজ কন্যাকে আত্মীয়-পরিবারবর্গের বাধা উপেক্ষা করে বিধবা-বিবাহ দেওয়া, প্রথম কাব্যগ্রন্থে দেবী বা দাসীর পরিবর্তে শ্বশুরকুলের পদবী 'মুখোপাধ্যায়' ব্যবহার করে *বঙ্গদর্শন* কর্তৃক সমালোচিত হওয়া ইত্যাদি ঘটনাও যুক্ত আছে মোক্ষদায়িনীর জীবনের সঙ্গে। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অবদান সংখ্যার বিচারে নিতান্তই সামান্য। তবে রচনার বিষয় বা পাঠক-প্রতিক্রিয়া আলোচনার দাবি রাখে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর প্রথম এবং একমাত্র কাব্যগ্রন্থ *বন-প্রসূন* সমকালে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল। বিশেষত এই

কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বাঙালীর বাবু' প্যারডি-কবিতাটি নানান পত্র-পত্রিকায় আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ কাব্যগ্রন্থে তাঁর বেশ কিছু কবিতার বিষয় নির্বাচন সমকালীন পরিস্থিতিতে বাঙালি গৃহবধুর অবস্থান থেকে যথেষ্ট চর্চাযোগ্য— 'প্রণয়', 'সীতাকুণ্ড', 'বালিকা বিধবা', 'সুরাপায়ীর বনিতার আক্ষেপ', 'দেশাচার', 'স্বপ্ন', 'শারদোৎসবে পতি বিরহিণী', 'ভগ্নি বিদায়', 'প্রোষিত ভর্তৃকা', 'প্রোষিত ভর্তৃকা (ঋতু পালন)', 'প্রোষিত ভর্তৃকা (পূর্ব্ব স্মৃতি)', 'প্রোষিত ভর্তৃকা (প্রেমোন্মাদ)', 'প্রোষিত ভর্তৃকা (ব্যাধি বিকার)', 'প্রোষিত ভর্তৃকা (স্বপ্নোদ্বেগ)', 'প্রোষিত ভর্তৃকা (আশা ভঙ্গ— সঙ্গিনীর প্রতি উক্তি)', 'প্রোষিত ভর্তৃকা (আশা ভঙ্গে সঙ্গিনীর উত্তর)' ইত্যাদি সেই জাতীয় কিছু কবিতার শিরোনাম। মোক্ষদায়িনীর দ্বিতীয় গ্রন্থ ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস *সফল স্বপ্ন*। উপন্যাস হিসাবে রচনাটিতে বিশেষ পরিণতি প্রকাশিত না হলেও এই গ্রন্থটিও বেশ কয়েকটি সংস্করণ এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী নলিনী ব্লেয়ার কর্তৃক "The Dream Fulfilled" নামে ইংরেজিতে অনুদিত হয়। *"খৃঃ ৭১৩ অব্দের প্রারম্ভে, যে সময়ে সিন্ধুদেশাধিপতি দাহির যবন কর্তৃক পরাজিত ও বিনষ্ট হয়েন, তাহার অল্প দিন পূর্ব্বের ঘটনাবলি উপলক্ষে এই আখ্যায়িকার অবতারণা"* [১] বলে জানিয়েছেন ঔপন্যাসিক। কিন্তু এখানে ইতিহাস আশ্রয় করলেও ইতিহাসের বর্ণনা বা যুক্তিক্রম অতিক্রম করে রূপকথাধর্মী কল্পনা, সমস্ত কিছুকে জোর করে মিলিয়ে দেওয়ার প্রবণতা, যুদ্ধবর্ণনা বা বাস্তব পটভূমিকে সরিয়ে নরনারীর প্রেম-অপ্রেম, নানান সামাজিকতা, যেনতেন প্রকারেণ প্রয়োজনে যুক্তির বাইরে গিয়ে মুসলমান সংসর্গ বাঁচিয়ে হিন্দু নারীর সতীত্ব রক্ষা ইত্যাদি দিকগুলি জোর পেয়েছে। মোক্ষদায়িনীর তৃতীয় তথা শেষ গ্রন্থ আমাদের আলোচ্য ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *কল্যাণ-প্রদীপ*। প্রকাশকালের দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখব, ১৮৮২-তে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ এবং ১৮৮৪-তে মাত্র দু-বছরের মধ্যে উপন্যাস প্রকাশের পর দীর্ঘ ৪৪ বছরের বিরতি শেষে মোক্ষদায়িনীর এই তৃতীয় গ্রন্থপ্রকাশ। রুবি চৌধুরানী এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

> *"নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত অনেক দিন তিনি আর কিছু লিখেন নাই। পারিবারিক নানা বিপদ-আপদের দায়িত্বের জন্য তিনি লিখিবার অবসর পাইতেন না। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্রপ্রতিম জামাতা ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যু, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বামী শশীভূষণের স্বর্গারোহণ, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা এটর্ণী সত্যসাধনের এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা উমেশচন্দ্রের, ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতৃজায়া হেমাঙ্গিনী দেবীর মৃত্যু তাঁহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছিল।"* [২]

কিন্তু মোক্ষদায়িনী তাঁর *কল্যাণ*-প্রদীপ-এর এক অংশে জানিয়েছেন যে নিয়মিত লেখালিখির 'অভ্যাস' তাঁর ছিল। তাছাড়া পারিবারিক বিপদ-আপদ, সাংসারিক ব্যস্ততা প্রথম অবস্থাতেও যথেষ্ট ছিল এবং সে সময় সেসবের মধ্যেই তিনি লেখনী চালিয়ে গেছেন। সেক্ষেত্রে এত দীর্ঘ বিরতি বেশ আশ্চর্যজনক।

তবে এই বিরতির কারণ যাই হোক না কেন, বিরতির ফলাফল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। *কল্যাণ-প্রদীপ*-এ এসে মোক্ষদায়িনীর লেখনীশক্তি আশ্চর্য পরিণতি পেয়েছে। *সফল স্বপ্ন*-র ক্ষেত্রে ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস রচনা করতে গিয়েও তিনি ইতিহাসের বাস্তবতার প্রতি, যুক্তিবিন্যাসের প্রতি যে উদাসীনতা দেখিয়েছিলেন, *কল্যাণ-প্রদীপ* জীবনী গ্রন্থ হলেও এখানে আলাদা পরিসর তৈরি করে ইতিহাস বর্ণনা, সেই ইতিহাসের বাস্তবতা, যুক্তিক্রম খুবই দক্ষতার সঙ্গে বজায় রেখেছেন গ্রন্থকার। ৪২৯ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ এই গ্রন্থের তিনটি বিভাগ-পূর্বাংশ (প্রথম–অষ্টাদশ উচ্ছ্বাস), মধ্যমাংশ (ঊনবিংশ–ঊনত্রিংশ উচ্ছ্বাস) এবং উত্তরাংশ (ত্রিংশ-অষ্টচত্বারিংশ উচ্ছ্বাস)। এগুলির মধ্যে পূর্বাংশে আছে বাংলার 'বৈষ্ণবী যুগ', 'পতনোন্মুখ মুসলমানী যুগ', 'নূতন প্রবর্ত্তিত ইংরাজী যুগ' এবং 'ব্রাহ্ম-সমাজ যুগ'- এই ইতিহাসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সেই সূত্রে কল্যাণের বংশের বিভিন্ন জনের অবস্থান। মধ্যমাংশে কল্যাণকুমারের জন্ম থেকে যুদ্ধযাত্রার আগে পর্যন্ত নানান ঘটনার বর্ণনা স্থান পেয়েছে। এবং উত্তরাংশে আছে ইংরেজ-তুরস্ক যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, জার্মান পক্ষে তুরস্কের যোগদান, ইংল্যান্ড-তুরস্ক যুদ্ধের সূচনা, প্রথমদিকে যুদ্ধে ইংরেজদের একাধিক জয় এবং তারপর লোভ ও আত্মম্ভরিতার বশে আরও অগ্রসর হতে গিয়ে তুরস্কের কাছে পরাজিত ও বন্দী হওয়া, দীর্ঘদিন বন্দীদশায় থেকে ইংরেজদের অসহায়ভাবে আত্মসমর্পন ইত্যাদি ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে এই শেষ অংশে। যুদ্ধবর্ণনার পাশাপাশি যুদ্ধক্ষেত্রে কল্যাণের অবস্থান ও সবশেষে তাঁর মৃত্যু দিয়ে এ গ্রন্থের সমাপ্তি ঘটেছে। সহজ-সরল বর্ণনাভঙ্গি, ইতিহাসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, পরিচিত দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে গিয়ে সমকালে সমান্তরালভাবে প্রচলিত

ইতিহাসের বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপন, পুঙ্খানুপুঙ্খ যুদ্ধবর্ণনা, যুদ্ধক্ষেত্রের রাজনৈতিক পটভূমির পাশাপাশি প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক পটভূমির বিশ্লেষণ ইত্যাদি নানান দিক থেকে '*কল্যাণ-প্রদীপ*' মোক্ষদায়িনীর শ্রেষ্ঠ রচনা তো বটেই, বাংলা সাহিত্যের আসরেও বিস্মৃত, অচর্চিত অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ।

গ্রন্থটির বিস্তারিত বিশ্লেষণ, পূর্বাংশে বর্ণিত বাংলার ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের স্বরূপ বা এর জীবনী অংশের আলোচনায় আমরা যাব না। আমরা দেখে নেব উত্তরাংশের যুদ্ধ বর্ণনার ক্ষেত্রে মোক্ষদায়িনীর পরিকল্পনা এবং বর্ণনার মধ্যে প্রকাশিত বাস্তবতার স্বরূপ কেমন ছিল। ত্রয়োস্ত্রিংশ উচ্ছ্বাসে মোক্ষদায়িনী জানিয়েছেন—

> *"আমাদের যুবকদের মনে যুদ্ধ-ব্যাপার শিক্ষা করিবার ইচ্ছা উৎপাদন করানও আমার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত নয়। চারিদিক ভাবিয়া, ব্রিটিশরা কেমন করিয়া তুরস্কের সহিত যুদ্ধের উদ্যোগ, আয়োজন করিয়া তুলিল তাহা আমার বিবেচনায় বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। আমার মনে হয় আমাদের যুবকেরা কাল্পনিক-প্রেমের আতিশয্যে বা বীভৎস-ব্যাপারে পূর্ণ কুৎসিত কুৎসিত নভেল নাটক পড়িয়া সময় নষ্ট না করিয়া যদি নেপোলিয়ানের সময়কার, বুয়ার যুদ্ধের, চীন-জাপানের, রুশো-জাপানের এবং গত ইউরোপীয় যুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করেন ত খুব ভালো হয়।"* [৩]

মোক্ষদায়িনীর এই ইতিহাস সচেতনতা, লেখনী ধারণের উদ্দেশ্য তাঁকে ইতিহাসের তথ্যসংগ্রহ, পরিবেশন ইত্যাদির ব্যাপারে নিবিড় গবেষণাধর্মী এবং নির্ভরযোগ্য করে তুলেছে। লেখনীর যে ৪৪ বছরের দীর্ঘ বিরতির কথা আমরা উল্লেখ করেছি তার শেষ ১২-১৩ বছর সময়কাল অর্থাৎ কল্যাণের যুদ্ধযাত্রা (১৯১৫) থেকে গ্রন্থপ্রকাশ (১৯২৮) পর্যন্ত সময়কাল মোক্ষদায়িনীর এই তথ্যসংগ্রহের এবং গ্রন্থরচনার সম্ভাব্য সময়কাল বলে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। উত্তরাংশের যুদ্ধবর্ণনার বিস্তারিত অংশের তথ্য মোক্ষদায়িনী সংগ্রহ করেছেন নানান জায়গা থেকে। যুদ্ধ সম্পর্কে প্রকাশিত বিভিন্ন সরকারি রিপোর্ট, যুদ্ধের ইতিহাস, যুদ্ধ চলাকালীন দেশে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ সাময়িক পত্র, যেমন— *সঞ্জীবনী*, *ডেলি নিউজ* ইত্যাদিতে প্রকাশিত যুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। একত্রিংশ উচ্ছ্বাসের শেষে তুরস্কের মিলিটারি হেড অফিসের এরকমই একটি রিপোর্টের উল্লেখ আছে। উত্তরাংশ শুরুর অল্প কয়েক উচ্ছ্বাস পরেই ত্রয়োস্ত্রিংশ উচ্ছ্বাসে এই তথ্যসংগ্রহ সম্বন্ধে জানিয়েছেন—

> *"ইরাক খণ্ডে তুরস্ক-ব্রিটিশের যুদ্ধের আভ্যন্তরিক অবস্থা ও ব্যাপারটা যে কি, তাহা এই উত্তরাংশের প্রথম তিন উচ্ছ্বাসে বিষদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সে সমস্তই ঐতিহাসিক তথ্য এবং ভারত গভর্ণমেন্টের প্রকাশিত মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধের ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত।"* [৪]

ফলে মোক্ষদায়িনীর যুদ্ধবর্ণনা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত হয়েছে। তুরস্কের জার্মান-পক্ষে যোগদান বা ইংল্যান্ড-তুরস্ক যুদ্ধের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি যেমন রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করেছেন, অর্থনৈতিক তথা ব্যবসায়িক দিক থেকে এই যুদ্ধে তুরস্ক বা ইংল্যান্ডের সুবিধা-অসুবিধা বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনই ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণগুলিও কিভাবে সক্রিয় ছিল তার ব্যাখ্যা করেছেন এবং গ্রন্থশেষে সংযুক্ত ম্যাপের উল্লেখ করেছেন—

> *"এই অংশের শেষে একটী ছোট মানচিত্র সংযোজিত হইল। ইহাতে কারাচী হইতে উক্ত সাগরদ্বয় পার হইয়া বাসরা, তথা হইতে মেসোপোটেমিয়া পার হইয়া বাঘদাদ এবং বাঘদাদ হইতে বসফোরাস পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের একটা মোটামুটি আন্দাজ পাঠকগণ পাইবেন। বিশেষভাবে উল্লিখিত স্থানগুলিতে X এই ভাবে চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। ব্রিটিশ-তুরস্কের যুদ্ধ ব্যাপার, এই মানচিত্র দৃষ্টে সহজেই বোধগম্য হইবে।"* [৫]

উপরোল্লিখিত ম্যাপটি ছাড়া ইরাক যুদ্ধের আরও একটি ম্যাপ, অর্থাৎ মোট দুটি ম্যাপ গ্রন্থশেষে সংযুক্ত করেছেন মোক্ষদায়িনী। এই ম্যাপগুলিতে স্থান চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী যুদ্ধবর্ণনা এগিয়েছেন এবং মাঝেমাঝেই ম্যাপের উল্লেখ করে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন রেখেছেন পাঠকদের। যুদ্ধবর্ণনার শুরু অর্থাৎ উত্তরাংশের প্রথম উচ্ছ্বাসেই (ত্রিংশ উচ্ছ্বাস) যুদ্ধক্ষেত্র ইরাক তথা মেসোপটেমিয়ার ইতিহাস, সেখানে বিভিন্ন সময় রাজত্বকারী বিভিন্ন সাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদির বর্ণনা দিয়ে তবেই যুদ্ধবর্ণনায় অগ্রসর হয়েছেন তিনি। এই দুরূহ বর্ণনা মোক্ষদায়িনী কত সহজে মনোগ্রাহী ও যুক্তিগ্রাহী করে তুলেছেন তা ত্রিংশ উচ্ছ্বাস থেকে উদ্ধৃত করে দেখানো যেতে পারে—

> *'উচ্চ আর নিম্ন' দুই ইরাকের আবহাওয়া খুবই খারাপ; কলেরা, প্লেগ তো লাগিয়াই আছে। ভাল পানীয় জলের বিশেষ অভাব। মাটির উপর দিয়া যাতায়াতের ভাল রাস্তা নাই। বৃষ্টি সেখানে খুব কমই পড়ে। নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহের ভিতর যে সকল প্রাচীন কেনাল ছিল তাহা বদ্ধ হইয়া গিয়া শুষ্ক জঙ্গলী অবস্থায় পড়িয়া থাকে। এক এক শুষ্ক কেনালে কোটি কোটি ব্যাঙের বাসা। ...এ সকল অসুবিধা সত্ত্বেও ইউরোপীয় যুদ্ধ বাধিবার বহু পূর্ব্ব হইতে ব্যবসা বাণিজ্য ও কারবার করিবার জন্য অনেক ইংরাজী প্রজা ও ভারতবর্ষীয় প্রজা বাগ্‌দাদে ও বাসরায় বসবাস করিয়া আসিতেছিলেন। ..."শাটেল-আরাব" নদীর মোহানা "ফাওতে" ঢুকিয়া অল্প কয়েক মাইল উত্তরবাহিনী হইলেই ঐ নদীর বাম কূলে "আবাদান" বন্দরের নাম ম্যাপে দেখিতে পাইবেন। ওখান হইতে ১৫০ শত মাইল উত্তরে, পারস্য রাজ্যের মধ্যে, কিন্তু সন্ধি ও করদসূত্রে ইংরাজদের দখলী প্রেট্রোলিয়ামের অনেক খনি আছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ইংরাজ সেখানে ঐ প্রেট্রোলিয়াম তোলাই সাফাই ও চালান করিবার সুবৃহৎ কলকারখানা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ১৫০ মাইল লম্বা পাইপে করিয়া ঐ তৈল আবাদানে বড় বড় গুদামে পৌঁছে আর ঐ তৈলের বড় বড় জাহাজ বন্দরে পৌঁছিলে উহা ভর্ত্তি করিয়া ঐ তৈল চালান দেওয়া হয়। ইংরাজরাজের সমস্ত রণপোত নাকি ঐ তৈলে চালিত হয়। আবাদানেও ইংরাজ ও ভারতের প্রজার অনেক বসতি। ঐ তৈল বিনা বিঘ্নে ও রীতিমতভাবে পাইবার জন্য ইংরাজ রাজ অবশ্যই দেখিতে বাধ্য যাহাতে জগৎ জোড়া যুদ্ধের অনল তুরস্কে আর পারস্যে প্রবেশ না করে; আর যাহাতে শাটেল্ আরাবে যাতায়াতের পথ পরিষ্কার থাকে। ঐ পথ রোধ করিতে তুরস্ক চেষ্টা করিলেই ইংরাজ তুরস্কে যে যুদ্ধ হইবে তাহা নিশ্চিত। আর তাহাই ঘটিল।"* [৬]

এভাবেই প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নানান বিষয়কে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে উপস্থাপন করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন মোক্ষদায়িনী।

তবে শুধুমাত্র সরকারি রিপোর্ট, সরকার প্রকাশিত যুদ্ধের ইতিহাস বা সংবাদ-সাময়িকপত্রে প্রকাশিত যুদ্ধের খবরাখবর থেকে প্রাপ্ত যুদ্ধবর্ণনাই নয়, মোক্ষদায়িনীর এ গ্রন্থের যুদ্ধবর্ণনা অন্যতর উচ্চতায় পৌঁছেছে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাঠানো কল্যাণের অনেকগুলি চিঠির সংযোজনে। উত্তরাংশ শুরুর অব্যবহিত আগে কল্যাণের যুদ্ধযাত্রা থেকে শুরু করে সমগ্র উত্তরাংশ জুড়ে কল্যাণের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বড় চিঠি এবং পোস্টকার্ড মিলিয়ে কল্যাণের মোট ২১টি চিঠি তারিখ ও অবস্থানসহ সরাসরি উদ্ধৃত করেছেন মোক্ষদায়িনী। এছাড়াও শেষ পর্বে যুদ্ধবন্দীদের নিয়ম অনুযায়ী মাসে মাসে পাঠানো চার লাইনের বেশ কিছু পোস্টকার্ড চিঠির কথা উল্লেখ করে একটি সারমর্ম গোছের চিঠি উদ্ধৃত করেছেন। সবশেষে কল্যাণের মৃত্যুসংবাদ সম্বলিত কল্যাণের বন্ধু ডাঃ পুরীর চিঠি উদ্ধৃত করে গ্রন্থসমাপ্তির দিকে এগিয়েছেন তিনি। উত্তরাংশে যুদ্ধবর্ণনার ঐতিহাসিক দিকের সঙ্গে কল্যাণের জীবনী অংশের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে এই চিঠিগুলি। চিঠিগুলি নিঃসন্দেহে এ গ্রন্থের অত্যন্ত মুল্যবান সম্পদ। যুদ্ধবর্ণনা অংশে নানান তথ্যাদির মধ্যে দিয়ে যুদ্ধের ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক দিকগুলি উঠে এলেও সেসবের পাশাপাশি যুদ্ধের ভয়াবহতা, অসারতা, দুরবস্থা ইত্যাদির মানবিক দিকগুলি, কল্যাণের মানসিকতা ও তার পরিবর্তন, প্রাপ্তিস্বীকার অংশের সূত্রে বাড়িতে কল্যাণের মায়ের ও পরিবারের বিভিন্নজনের মানসিক অবস্থান ইত্যাদি কল্যাণের এই চিঠিগুলিতে অনেকখানি চিত্রিত হয়েছে। যুদ্ধযাত্রার শুরুতে করাচী থেকে লেখা প্রথম চিঠিতেই জাহাজে খচ্চর বা মিউল তোলার হৃদয়বিদারক বর্ণনার মধ্যে দিয়ে আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাব্য ভয়াবহতার কল্পনা করেছে কল্যাণ। চতুর্থ চিঠিতে নাসিরিয়া থেকে কুতেল-আমারা যাওয়ার সময় যুদ্ধবিধ্বস্ত মরা মানুষের স্তুপের উপর দিয়ে দুর্গম পথে সুনাইয়াট যাত্রার বর্ণনা স্থান পেয়েছে। যাত্রাপথে মৃত্যুমুখী সাহেবকে কল্যাণের সেবা ও তার প্রতিদানে সাহেবের মৃত্যুর আগের মুহূর্তে কল্যাণের পায়ে চুম্বনের চেষ্টার মর্মস্পর্শী বর্ণনা কল্যাণের বয়ানে উঠে এসেছে। এরকম আরও অনেকগুলি চিঠিতে যুদ্ধের ভয়াবহতার বিভিন্ন ধরনের মরমী বর্ণনা আমরা পাই। পঞ্চদশ ও ষোড়শ চিঠিতে কল্যাণের বাম কনুইয়ে গুলি লাগার বর্ণনা যেমন এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য, তেমনই একেবারে শেষ পর্বে যুদ্ধে পরাজিত ও তাড়িত হয়ে কুতেল-আমারাতে এসে ৫ মাস ঘেরাও অবস্থায় থাকার চুড়ান্ত দুর্দশার ছবিতে অষ্টাদশ চিঠি গুরুত্বপূর্ণ—

> *"প্রায় ১ মাস সৈন্যরা অর্দ্ধেক র‍্যাসান খেয়ে আসছে, প্রায় ১৫ দিন থেকে র‍্যাসান কমে কমে সিকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, এত কমিয়েও আর তিন দিনের মাত্র রসদ আছে। ২।৩ মাস আধপেটা ও তারপর সিকিপেটা খেয়ে*

> *সব সৈন্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের মত দেখতে হয়েছে। হাঁসপাতালে মৃত্যু সংখ্যা খুবই বেড়েছে। গত ১৫ দিন থেকে লোকে না খেতে পেয়ে মরচে। ওষুধে আর কি হবে? খাবার কিছুই নেই। না খেতে পেয়ে দুর্ব্বল হয়ে লোক হাঁসপাতালে আসছে। তাকে কি করে খাবার অভাবে ভাল করা যায়! তা ছাড়া ওষুধও সব ফুরিয়ে গেছে।"* [৭]

যুদ্ধক্ষেত্রের এ ভয়াবহ মানবিক দিকগুলি তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই চিঠিগুলির ভূমিকা অপরিসীম।

যুদ্ধ সম্পর্কে বাইরে থেকে আরোপিত রোমান্টিকতা, আবেগ-উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধ-পরিস্থিতির বাস্তবতার কতখানি তফাত সে বিষয়টিও ধরা পড়েছে উদ্ধৃত চিঠিগুলিতে। কল্যাণ প্রেরিত চিঠিগুলি যদি ক্রমান্বয়ে পাঠ করা যায়, তাহলে যুদ্ধ সম্পর্কে কল্যাণের মানসিকতার পরিবর্তনের দিকটি সহজেই চোখে পড়বে। যুদ্ধযাত্রার আগে দাঁড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে নিষেধ করা আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে কল্যাণ বীরত্বব্যঞ্জক উত্তর দেয়—

> *"যখন বাঙ্গালী হইয়াও স্পর্ধা করিয়া ইংরাজদের হাত হইতে সম্মানের বা লড়াই করিবার অস্ত্র শস্ত্র, তরোয়াল, বন্দুক পাইয়াছি— যখন আমি লড়ায়ে রাজ-আজ্ঞা পালন করিব বলিয়া শপথ করিয়াছি তখন— আমি পেছ-পা হইয়া, কুণো হইয়া কাজ ছাড়িয়া লুকাইয়া বসিয়া থাকিতে পারিব না। আর আমার একটা প্রাণের জন্য সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে, ভীরু কাপুরুষ নেমক-হারামের বদনাম খাওয়াইতে পারিব না। আমাদের জাতের সে বদনাম ত আছেই— তবু সেটা কাটিয়ে আমরাও যাতে বীরজাতির ভিতর গণ্য হইতে পারি, আমার সেদিকেও ত দৃষ্টি রাখা দরকার। তোমরা কি বল্‌ছ? একটা প্রাণের জন্য আমার ইজ্জৎ খোয়াইব? তাহলে ত আমার গলায় দড়ি দিয়ে এখনি কড়িকাঠে ঝুলে পড়া উচিত। ছি! ছি!"* [৮]

সেই কল্যাণই যুদ্ধ অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে যুদ্ধ সম্পর্কে নানান নেতিবাচক মন্তব্য করতে থাকে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কোনোরকমে দেশে ফিরে রিসার্চের কাজে যোগ দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করে, এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সেনা বিপক্ষ তুরস্কের সামনে আত্মসমর্পন করলে ডাক্তার হিসেবে সে বা তারা যুদ্ধবন্দীদের তুলনায় কিছুটা বেশি সুযোগ-সুবিধা পাবে সেই আশায় আত্মসমর্পনের প্রার্থনা করে। এখানে পরপর চিঠিগুলি অনুসরণ করে আমরা কল্যাণের এই মানসিকতা পরিবর্তনকে দেখে নেব— প্রথম চিঠিতে জাহাজে খচ্চর তোলার মধ্যে দিয়ে যুদ্ধের ভয়াবহতার আভাস পাওয়া কল্যাণ তার দেখা প্রথম যুদ্ধ অর্থাৎ নাসিরিয়া যুদ্ধের পর লেখা তৃতীয় চিঠিতে যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাগুলির মধ্যে সাহসিকতার সঙ্গে ডাক্তারি করে যাওয়ার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে। উৎসাহব্যঞ্জক সে বর্ণনার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের 'এত রক্ত কেন' অংশ উদ্ধৃত করে যুদ্ধের বাস্তবিক অমানবিক দিককে আভাসিত করেছে সে—

> *"তিনটা নাগাত একদল বন্দী ও শত্রুপক্ষের আহত এসে উপস্থিত হল। আমিত সাড়ে ছ'টা ভোর থেকে ১টা পর্য্যন্ত নিশ্বাস ফেলতে অবসর পাইনি। রক্তের নদী, লাল— চারিদিকে— নিজে রক্তে মাখামাখি আমি। কাকে— রেখে কাকে দেখি। বিসর্জ্জনের ধ্রুবের "এত রক্ত কেন" মনে হয়। কেন এত রক্ত পাত!! কি আর বর্ণনা করব? জীবনে কখনও এ দৃশ্য ভুলব না।"* [৯]

এরপর চতুর্থ, পঞ্চম চিঠিতে আরও কিছু দুরবস্থার বর্ণনা পেরিয়ে ষষ্ঠ চিঠিতে স্বদেশপ্রেম বা স্বজাতিপ্রেমের নামে যুদ্ধের আবহ সৃষ্টির সরাসরি তীব্র বিরোধিতা করেছে কল্যাণ। সেই সূত্রে দেশে সদ্যোত্থিত 'Patriotism'-এর নিন্দাবাদও করেছে। সপ্তম চিঠিতে একটানা মার্চ করার ক্লান্তি বর্ণনার পাশাপাশি তার মতোই যুদ্ধ সম্পর্কে রোমান্টিক, আবেগী মনোভাব নিয়ে বাংলা থেকে আসা ৩২ জনের 'বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স' নামের ভলেন্টিয়ার দলের আশাভঙ্গ, দুর্দশা, সাহেবদের কাছ থেকে প্রাপ্ত দুর্ব্যবহার ইত্যাদির বর্ণনা করেছে কল্যাণ। এরপর যদিও মা যখন তাঁর আগের চিঠিতে 'বদলির আবেদন' করার অনুরোধ করেন, তার প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে অষ্টম চিঠিতে যুদ্ধের আবহে ক্ষুদ্র গৃহস্বার্থকে উপেক্ষা করার বীরত্বব্যঞ্জক ব্রতর ঘোষণা করেছে কল্যাণ, তবে তার সামান্য পরেই সরকারি Despatch-এ নাম mentioned হওয়ার সৌভাগ্যের লোভ প্রকাশ সে ব্রতকে দুর্বল করে দিয়েছে—

> *"রাশি রাশি লোক— কত লর্ড ব্যারণের ছেলে সদ্য বিয়ে করে এসে তোপের মুখে প্রাণ দিচ্ছে। আর আমি সে ওজর করে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালাব? তোমার কোন ধারণাই নেই। গুলি বৃষ্টি গোলা ফাটার মধ্যে থেকেও যে লাগেনি— এই ভাগ্যি। শুনলাম— এবারকার যুদ্ধে, চারিদিকে গোলার মধ্যে জখমিদের ড্রেস করেছি— তা আমার ব্রিগেডের জেনারেল দেখেছেন ও দেখে খুসী হয়েছেন। যদি এই "কুত"এর যুদ্ধের বিবরণে (ডেসপ্যাচে) আমার নাম দেন তাহলে সেটা খুব*

মান্য। ...দুর্ভাগ্য ক্রমে আমি মোটে দুটো যুদ্ধে যোগ দিয়েছি। তাছাড়া অনেকটা 'কপাল' থাকা চাই। কোন জেনেরাল্ জাতীয় লোকের চক্ষে না পড়লে তো আর mentioned হওয়া যায় না।" [১০]

বোঝাই যাচ্ছে যুদ্ধ সম্পর্কে রোমান্টিকতা, আবেগ পরিণত হয়েছে প্রয়োজন অথবা স্বার্থর যুক্তিতে। নবম চিঠিতে আবার Patriotism-এর সমালোচনা ফিরে এসেছে। এবার সেই সূত্রে এসবের সূত্রপাতকারী হিসেবে ইংল্যান্ডকে চিহ্নিত করে তাদের সমালোচনাও করতে দ্বিধা করেনি কল্যাণ। দশম চিঠিতে যুদ্ধশেষ হওয়ার মনোবাসনা প্রকাশিত হয়েছে। শত্রুপক্ষের প্রায় দোষহীনতা এবং নিজেদের অকারণ লোভ-লালসার কথা মাকে জানিয়েছে কল্যাণ—

"জানিনা আস্‌ছে তিন মাসের ভিতর দেশে ফিরতে পারব কিনা— দেখ দেখি কি অনাছিষ্টির যুদ্ধ— চলিইছে। কোথায় আই. এম. এস হয়ে, শান্ত ভাবে দেশে থেকে কিছু রীসার্চের কাজ করবো; তোমাকে একটু শান্তি দিব— না এইখানে পড়ে রহিলাম। ...আমরা তো অনেক এগিয়ে এসেছি— আর কেন? আমরাইত জয়ী হয়ে শত্রুর সব কেড়ে নিচ্চি; শত্রুত এখনও কিছু করেনি।" [১১]

বোঝা যায় যুদ্ধ সম্পর্কে 'বীরত্ব' 'সম্মান' ইত্যাদির রোমান্টিকতা থেকে মানসিকভাবে ধীরে ধীরে অনেকখানি দূরে চলে এসেছে কল্যাণ। একাদশ চিঠিতে অকারণ যুদ্ধযাত্রার প্রসঙ্গ পেরিয়ে দ্বাদশ চিঠিতেও একই সুর- 'যুদ্ধ থামিবার কোনও লক্ষণ' যে সে দেখছে না সেই হতাশা প্রকাশ পেয়েছে চিঠির শুরুতেই। এরপর আরও কিছু যুদ্ধ সংক্রান্ত খবরাখবর, প্রয়োজনীয় দ্রব্য চেয়ে পাঠানো পেরিয়ে লাজ গ্রাম থেকে পাঠানো পোস্টকার্ড চিঠিতে (কল্যাণের পঞ্চদশ চিঠি) তার বাম কনুইয়ে গুলি লাগার সংবাদ জানায় কল্যাণ। পরবর্তী চিঠিতে এই গুলি খাওয়ার ঘটনা বিস্তারে বর্ণনা করার সময়—

"নামে মাত্র গুলি লেগেছে। একটু বেশী রকম লাগলে ইণ্ডিয়া যাবার জন্যে ছুটী চাইতে পারতাম।" [১২]

এ উক্তি তার যুদ্ধযাত্রার আগের উক্তির প্রায় বিপরীত অবস্থানের পরিচয়বাহী। সপ্তদশ চিঠিতে মায়ের অনুরোধের উত্তরে বদলি যে অসম্ভব সেই অসহায়তা ফুটে উঠেছে। এরপর কল্যাণের চিঠি লেখায় ৫ মাসের দীর্ঘ সময় বিরতি পড়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনা পরম্পরা অনুযায়ী এই পাঁচ মাস তারা 'কুতেল-আমারা'-তে ঘেরাও অবস্থায় ছিল। ঘেরাও অবস্থার দুর্দশা বর্ণনার পাশাপাশি অষ্টাদশ চিঠিতে যুদ্ধ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে পৌঁছে গেছে কল্যাণ—

"বন্দী হলে তোমাদের আর কোনও ভাবনার কারণ থাকবে না। প্রথমতঃ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে থাকব। কাণের পাশ দিয়ে ২৪ ঘণ্টা গোলা গুলি চলবে না, যুদ্ধ থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে। তারপর ডাক্তারেরা সে রকম বন্দী নয়। যেখানেই রাখুক আমরা ঘুরে বেড়াতে পারব। তুর্কিরা তাছাড়া অফিসারদের খাতির করবে। এমন কি ডাক্তারদের শীঘ্র ছেড়েও দিতে পারে। ...এক একবার মনে হয়— যখন গুলি লেগেছিল ও আহত হয়ে বসরায় যাবার সুযোগ ছিল, তখন কেন মরতে যাইনি।" [১৩]

যুদ্ধ সংক্রান্ত বৃহত্তর স্বার্থের তত্ত্ব, আবেগ, রোমান্টিকতা সম্পূর্ণ মুছে বাস্তবতার আঘাতে ব্যক্তিগত তথা স্বাভাবিক মানবিক স্বার্থের বিষয় প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে কল্যাণের এই বয়ানে। এর পরের বাকি চিঠিগুলিতে অসহায় অবস্থায় ইংরেজদের আত্মসমর্পণের খবর ও সেই খবরে সর্বোতভাবে খুশি হওয়া কল্যাণ (উনিবিংশ চিঠি), আত্মসমর্পণের পর তুরস্কের কমান্ডারের সুব্যবহার, মাকে চিন্তা দূর করতে বলে বাড়ি ফেরার ইচ্ছাপ্রকাশ (বিংশ চিঠি), ভালো খাওয়া-দাওয়া এবং সুস্থ হয়ে ওঠার সংবাদ (একবিংশ চিঠি) ইত্যাদি কল্যাণের যুদ্ধ পরবর্তী সেই নতুন মানসিকতারই সম্প্রসারণ।

লক্ষ্য করব '*কল্যাণ-প্রদীপ*' রচনার উদ্দেশ্য হিসাবে মোক্ষদায়িনী উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন—

"কল্যাণের আশৈশব জীবনের মধুরতা, যৌবনের অশ্রান্ত উদ্যমের, প্রেরণার, উচ্চ আকাঙ্ক্ষার, বড় হইবার, কর্ম্মী হইবার, কৃত্য হইবার, অদম্য উৎসাহের ও সদ্‌গুণের গল্প যদি আমাদের দেশের সহস্র সহস্র শিক্ষিত ও দুর্ভাগ্যবশতঃ ভগ্নোদ্যম যুবকেরা জ্ঞাত হয়েন তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয় উপকৃত হইবেন— এই বিশ্বাসে ভর করিয়া আমার অশীতি বর্ষের লেখা এই শেষ বইখানি আমি তাঁহাদেরই কর-কমলে অর্পণ করিলাম।

কল্যাণকুমারের জীবনী পাঠে যদি দেশের একটীও ভগ্নোদ্যম যুবক পুনরায় নবশক্তিতে দেশের কল্যাণকর কর্ম্মক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিবার স্পৃহা নিজ-হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিতে পারে তাহা হইলেই আমার এই "কল্যাণ-প্রদীপ" লেখা সার্থক হইয়াছে জ্ঞান করিব।" [১৪]

এমনকি গ্রন্থশেষেও একই ঘোষণা করেছেন তিনি। কিন্তু গ্রন্থের সমাপ্তি পর্বে এসে যুদ্ধের করুণ পরিণতি এবং কল্যাণের এই মানসিকতার পরিবর্তন সেই ঘোষিত উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দাঁড় করিয়ে দেয় পাঠককে। এই পরিণতি,

এই শেষোক্ত স্বাভাবিক মানবিক স্বার্থের বাস্তবিক মানসিকতায় কোনো 'ভগ্নোদ্যম যুবক'-এরই যুদ্ধকে 'দেশের কল্যাণকর কর্ম্মক্ষেত্র' বলে মনে হতে পারে না, সেখানে 'জীবন উৎসর্গ করিবার স্পৃহা' জেগে উঠতে পারে না। কাজেই মোক্ষদায়িনী এখানে তাঁর ঘোষিত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থেকে যে গ্রন্থশেষে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে পৌঁছে গেছেন সেকথা বলা যেতেই পারে। আপাতভাবে যে কোনো গ্রন্থকারের পক্ষে এই লক্ষ্যচ্যুতি নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয়বাহী। আর এখানেই, এই ব্যর্থতাতেই এ গ্রন্থের সার্থকতা। মোক্ষদায়িনী কোনো পূর্বপরিকল্পিত কাল্পনিক কাহিনি নির্মাণ করতে এ গ্রন্থরচনা করেননি। বাস্তবে ঘটে যাওয়া কল্যাণের জীবন, বংশপরিচয় ও ইতিহাসের ঘটনাবলী তথ্য ও প্রমানসহ উপস্থাপিত করেছেন। নিজের বিশ্লেষণীক্ষমতা, শিক্ষা-দীক্ষা, ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক বোধ, মতাদর্শ ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় সে উপস্থাপনাকে সজ্জিত করলেও কল্যাণের চিঠিগুলি সরাসরি উদ্ধৃত করায় সেখানে মোক্ষদায়িনীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি যুদ্ধকে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করা কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গিও সরাসরি উঠে এসেছে। আর সেখানেই এ-গ্রন্থ বইয়ে-পড়া বা অন্যের প্রভাবিত মতাদর্শগত রোমান্টিকতার গণ্ডী অতিক্রম করে বাস্তবতার কঠিন মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যুদ্ধ সম্পর্কে রাষ্ট্রনির্মিত আবেগের, রোমান্টিকতার বাণীপ্রচার নয়, বরং শাশ্বত মানবতার যুদ্ধবিরোধী, শান্তিকামী মানসিকতায় সমাপ্ত হয়েছে মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের '*কল্যাণ-প্রদীপ*'।

তথ্যসূত্র :

১. মুখোপাধ্যায়, মোক্ষদায়িনী, *সফল স্বপ্ন*, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১
২. চৌধুরানী, রুবি, *বাণী-সেবায় বাংলার নারী*, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৩, পৃষ্ঠা-১৮
৩. দেবী, শ্রীমতি মোক্ষদা, *কল্যাণ-প্রদীপ*, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫, পৃষ্ঠা-২৪৮-৪৯
৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৪৭
৫. তদেব, পৃষ্ঠা-২০৫
৬. তদেব, পৃষ্ঠা-২১৮-২২১
৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৯৯-৪০০
৮. তদেব, পৃষ্ঠা-২০৬
৯. তদেব, পৃষ্ঠা-২৯৩
১০. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২৯
১১. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩৬
১২. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৬৬
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৪০০-৪০২
১৪. তদেব, উৎসর্গ পত্র